ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1086-1092
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.326

রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তায় মানুষের ধারনা

দেবাশিস বিশ্বাস, *গবেষক, মানবিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কলা ও গ্রামীণ প্রযুক্তি বিভাগ (দর্শন), ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ধারওয়াড়, কর্ণাটক, ভারত*

Received: 12.03.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the latter half of the nineteenth century and the early twentieth century, several Indian thinkers engaged in philosophy outside the boundaries of traditional Indian schools of thought. Among them, one of the greatest was Rabindranath Tagore. Though celebrated across the world as the "Poet Laureate of Bengal," Tagore's poems, essays, and songs reveal a deep and original vision of life and the universe with remarkable philosophical depth. His famous Hibbert Lectures were later collected and published as '*The Religion of Man*'. The title itself makes us wonder—if it's not The Religion of God, does that mean Tagore was an atheist? However, what becomes clear through '*The Religion of Man*' is that the central focus of Tagore's philosophy is the human being. Naturally, this raises questions: What is the true nature of a human being? What role do humans play in this world? Was Tagore speaking about a particular community or a specific period of history? And while exploring these questions, did he turn to Advaita Vedanta for guidance? So then, what does this Religion of Man actually mean? Why did Tagore feel the need to search for a new kind of religion centred on humanity? And how does it differ from the many established religions we already know? My research paper will make a sincere attempt to explore these questions, even if only in brief.

Keywords: Religion, Humanism, Surplus in man, Advaita Vedanta, Idea of God

সাধারণত কোন দার্শনিক তাঁর চিন্তাধারা কোনো বিশেষ তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করে থাকেন এবং সেই তত্ত্বের বাক্যগুলি যুক্তির আকারে সাজানো থাকে। দার্শনিকের কাছে যৌক্তিকতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। কিন্তু কবি দার্শনিকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব লক্ষ্যণীয়। কবি-দার্শনিকের চিন্তাধারা মূলত তাঁর কল্পনার প্রকাশ। তারা বহু সময়ই কোন অনুভূতির মাধ্যমে তাঁর দার্শনিক তত্ত্বকে সাজানোর চেষ্টা করেন। তাই সেক্ষেত্রে তাঁর মূল বক্তব্য বুঝতে গেলে প্রয়োজন হয় অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন। রবীন্দ্র দর্শনেও পাই এমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, আমরা জানি যে, দর্শনের অর্থ 'দৃষ্টি'। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই 'দর্শন' শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি 'দর্শন' বলতে বুঝিয়েছেন, কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টি, যার মাধ্যমে আমরা অনুভব করি অকৃত্রিম সত্যকে। আবার অন্যদিকে দৃষ্টির পাশাপাশি চলে আসে দ্রষ্টার প্রসঙ্গ, কেননা দৃষ্টি মানে কোনো না কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি। তাই ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দৃষ্টি অথবা দর্শন কোনটাই সম্ভব নয়। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তির অনুভূতির উপর। তাঁর মতে ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যের আলোচনা করা

অসম্ভব। তাই তাঁর দর্শন ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শন। তাঁর কাছে এই ব্যক্তি হলো মানব। তাঁর দর্শন হল মানবতাবাদী দর্শন।

কেউ কেউ মনে করেন, যে বেদ ও উপনিষদের প্রাচীন আদর্শ কবির মনে গাঁথা, কিন্তু তবুও সেই আদর্শের দ্বারা সম্পূর্ণরুপে কবি কখনোই প্রভাবিত হননি। তাঁর মতে উপনিষদ ও বেদান্তে যা বলা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে মানুষের সাধারণ জীবনধারার কোন যোগ নেই। তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বৈষ্ণবভক্তি মার্গের প্রতি, যা তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

সেখানে ভক্তিগীতের মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের প্রেম মানবপ্রেমেই সমন্বিত হয়েছে। সেই ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তাছাড়াও উপনিষদের ব্রহ্ম এবং বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য, তা দেখতে পেয়েছেন ভগবতগীতায়। সেখানে নিরাকার ব্রহ্ম ও সাকার ঈশ্বরের ভেদ মুছে যায়। তিনি একদিকে অদ্বৈতবাদী, অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। তাই বলা যেতে পারে যে, তাঁর মানবতাবাদী দর্শন আস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদী- এই উভয়ের মধ্যেই বিচরণ করে। একদিকে তিনি যেমন মিলিয়েছেন কাব্য ও দর্শনকে, অন্যদিকে মানবতা ও আধ্যাত্মিকতাকে। তাই তিনি মানুষের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই পরম সত্তাকে। তাই তিনি অদ্বৈতবাদী হয়েও তিনি বাস্তব-বিমুখ নন। তাকে সেই অর্থে বলা যেতে পারে মূর্ত অদ্বৈতবাদী বা Concrete Monist. তিনি বহুত্বের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করেছেন এই মানবের বিশ্বকে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্রহ্ম যতটা সৎ ও সত্য, আমাদের এই মানব-বিশ্ব, এই বহুত্বের জগতও ততটাই সত্য। ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বটে কিন্তু মানুষ নিজের ক্ষমতায় ও প্রতিভায় তাকে বাসযোগ্য করে তুলেছে। তাই এই বিশ্ব হলো মানুষের বিশ্ব। তিনি বলেছেন,

> "পথ চলছিল একটানা বাইরের দিকে, তাঁর নিজের মধ্যে নিজের অর্থ ছিল না। পৌঁছল এসে ঘরে, সেখানে অর্থ পাওয়া গেল, আরম্ভ হল ভিতরের লীলা। মানুষ এসে পৌছল সৃষ্টির ব্যাপারে, কর্মবিধির পরিবর্তন ঘটলো, অন্তরের দিকে রইল তাঁর ধারা।"[১]

দার্শনিক দিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের আবির্ভাবপূর্বে শুধুই বস্তু জাগতিক ক্রিয়াকলাপ চলছিল। সেখানে শুধুই বস্তুর জড় স্বভাবের প্রসারণ অথবা অভিব্যক্তি চলছিল। কিন্তু মানুষের উদ্ভবের পরই সমস্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া অন্তর্মুখী হল, অভিব্যাক্তির ঝোঁক পড়ল মানবমনের দিকে।

কাজেই, মানুষের আবির্ভাব প্রকৃতির অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার আমূল পথ পরিবর্তন করেছে, তাকে শুধুই বহির্মুখী না করে, অন্তর্মুখী করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় মানুষের আরও একটি কারনে গুরুত্ব রয়েছে, সেটি হল তিনি জাগতিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রাধান্য কে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
> চুনি উঠল রাঙা হয়ে, আমি চোখ মেললুম আকাশে-
> জ্বলে উঠলো আলো
> পুবে পশ্চিমে।
> গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'
> সুন্দর হল যে।"[২]

কাছেই জগৎ এর অস্তিত্ব নির্ভর করছে মানুষের চেতনার উপর। তিনি একথা বলেছেন যা ঘটে তা সবসময় সত্য নয়, মানুষ যা রচনা করে তাই সত্য। আইনস্টাইনের সঙ্গে এক কথোপকথনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যা

সত্য তা কখনই নৈর্ব্যক্তিক ও মনুষ্য নিরপেক্ষ নয়। এই বিশ্বজগতে এমন কিছুই নেই যা ব্যাক্তি মানুষের সীমানার বাইরে। কারন মানুষই হল সবকিছুর কেন্দ্রে। এর থেকে একথা স্পষ্ট যে রাবীন্দ্রিক ভাবনায় মানুষের একটি দার্শনিক ভূমিকা রয়েছে। মানুষই তাঁর দর্শনের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন মানুষের স্বরূপটি কেমন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে, ভাষণে মানুষের স্বরূপের দুটি দিকের কথা বলেছেন। 'শান্তিনিকেতন' ভাষণবলীর 'দ্বিধা' নামক ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। যে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। এক দিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর এক দিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।" আবার, 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ আছে তাঁর দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তাঁর জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব।"[৪] "দ্বিধা" ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেকার এই দ্বন্ধের কথা বলেছেন- "মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়।" মনুষ্যত্বের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড দ্বন্ধ রয়েছে তাকে তিনি বলছেন, প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্ধ। একদিকে স্বার্থ অন্যদিকে পরমার্থ, একদিকে বন্ধন অন্যদিকে মুক্তি, একদিকে সীমা অপরদিকে অসীম অনন্ত। মানবসত্তার এই দুটি দিককে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, কখনো বলেছেন 'আত্মা' ও 'অহং' (যেমন 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধমালার দ্বিতীয় প্রবন্ধে); আবার কখনো তিনি মানুষের এই দুটি দিককে 'বড় আমি' আর 'ছোট আমি' বলেছেন (যেমন 'আত্মপরিচয়')। এই দুই দিকই মানুষের স্বরূপেরই অংশ।

এখন মানুষের মধ্যে যে দিকটি প্রাণীকূলের অনুকরণে গড়ে ওঠে তাকে মানুষের সসীম স্বরূপ বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই স্বরূপটিকে 'জীবভাব' নামেও চিহ্নিত করেছেন। মানুষ তাঁর জীবভাবে নিজের উপস্থিতিকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়, এই স্বরূপে সে তাঁর জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিকে কেন্দ্র করেই জীবন নির্বাহ করে। অর্থাৎ, যে স্বভাবে মানুষ শুধুই জীবরূপে বাঁচতে চায় তাই হল মানুষের সসীম স্বরূপ। এখানে প্রধান লক্ষ্য হল সেই সমস্ত কিছু যা সাধারন মানুষের কাম্য; অর্থাৎ অর্থ, বিত্ত, যশ, খ্যাতি প্রভৃতি। এই দিকটি সর্বদা তাঁর জৈববৃত্তির চরিতার্থতা চায়। এই দিকটিতে মানুষ যা যা তাঁর বৃত্তি আছে, সব নিয়োজিত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য উন্নতি সাধন ও সাফল্য লাভের জন্য।

কিন্তু মানুষ সর্বদা নিজেকে এই বিষয়ের জগতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় না। তখনই প্রকাশিত হয় মানুষের অপর একটি দিক। সে তখন আরও উচ্চতর জগতে বাস করতে চায়। তাঁর মতে যখনই তাঁর দৈহিক সসীমতার উর্ধে উঠে মহত্তর কোন কিছু করতে উদ্দত হয়, তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপর ও মানবিক কাজে যুক্ত হয়, তখনই তাঁর মধ্যে অসীম স্বরূপের উন্মোচন ঘটে। এই অসীম স্বরূপ আসলে মানুষের মধ্যেকার বিশ্বমানব। তাই রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, "মানুষের মধ্যে সেই জীব পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে এই আদর্শ অন্নের মত নয়, বস্ত্রের মতো নয়, এই আদর্শ এক আন্তরিক আহ্বান, এই আদর্শ একটা নিজ নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ- যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তাঁর পূর্ণতা, যে দিকে ব্যাক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, সে দিকে বিশ্বমানব।"

মানুষের প্রবল প্রাণশক্তি সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরিয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের অসীম স্বরূপের অন্তঃস্থিত এই জীবনীশক্তির দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "The Power that lies behind is neither physical nor mental, it belongs to the inward self where man is united with this God." [৫]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন মানুষের অন্তঃস্থিত এই অসীম প্রকৃতি তাকে অমরতার স্বপ্ন দেখায়। মৃত্যু হল মানুষের সসীম অস্তিত্বের একটি ভ্রমমাত্র। মানুষ তাঁর অসীম প্রকৃতির দ্বারা মৃত্যু নামক ভ্রমকে অগ্রাহ্য করে অমরত্বের প্রতি অগ্রসর হয়।

মানুষের অসীম স্বরূপের প্রধান লক্ষ্য হল ত্যাগ ও তপস্যা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষ' বলতে কখনই কোন বিশেষ দেশের, কালের, যুগের গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের কথা বলেন নি। তিনি মনে করেন যে মানুষের বর্তমান পরিচয় তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর একটা উন্নততর ও বৃহত্তর পরিচয় আছে, যে পরিচয় তাকে বিষয়-সর্বস্বতার মধ্যে বেঁধে রাখে না তখন মানুষ জীবাত্মা থেকে উত্তীর্ণ হয় পরমাত্মার। ভারতীয় দর্শনে যেমন বলা হয় যে অসংখ্য জীবাত্মার মধ্যেই এক পরমাত্মা বিরাজ করেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই মনে করেন যে প্রত্যেক ব্যাক্তি মানবের মধ্যে নিহিত আছে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।

এই অসীম দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের মধ্যে স্মিত সামান্য', 'মানুষের মধ্যে উদ্ধৃত', 'মানুষের মধ্যে দেবত্ব' এরকম নানা নামে উল্লেখ করেছেন। মানুষের অসীম দিকটিকে সুনির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা দুরহ। তাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন জীবনের নানা ধরনের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে দিয়ে মানুষের উদ্ধৃত দিকটির উন্মোচন ঘটে। মানুষ যখন ব্যাক্তিগত স্বার্থ ও জড় প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে তাঁর বৃহৎ, সৃজনশীল মানুষ হয়ে ওঠাই মানবজীবনের লক্ষ্য। মানুষ যখন বাহ্য প্রকৃতির ভোগবিলাস থেকে মন সরিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে একাত্ম হয়ে সর্বজনীন, সর্বকালীন মানবকে উপলব্ধি করে, তখনই সে পূর্ণতা অর্জন করে। কাজেই মানব-সত্যের পূর্ণতার উপলব্ধির জন্য মানুষের মধ্যে যে বৃহৎমানুষ বা সর্বজনীন, সর্বকালীন মানব আছে তার জ্ঞান প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই অন্য মানুষকে যাকে বাউলেরা 'মনের মানুষ' বলে তাকেই রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত' বলেছেন। মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, তাঁর আত্মপ্রকাশের বাসনা, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি নান্দনিক বোধ, বিজ্ঞান,দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে যে উৎকর্ষের প্রকাশ ঘটে তা প্রমান করে মানুষের অন্তরে এক উদ্বৃত্ত সত্তার বাস। এই উদ্বৃত্ত সত্তাই যেন জীবজগতে 'বাড়তির ভোগ'। জড় প্রকৃতির মধ্যে মানুষের এই দিকটি কুলায় না।

রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে অথর্ববেদ'কে অনুসরণ করে বলেছেন,

> "স্বতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
> ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিস্তে বীর্যং লক্ষ্মীবর্লং বলে।"[৬]

রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন- স্বত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র-শ্রম, ধর্ম-কর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ, বীর্য-সম্পদ-বল সমস্ত মানুষের উদ্বৃত্তে অবস্থিত। এই সকল মানব গুণ যোগে জীবধর্ম সীমার অতিরিক্ত যে সত্তা তা কখোনই অমানব নয়। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যে 'মানবব্রহ্ম'। আমাদের ঋতে, সত্যে, তপস্যায়, কর্মে সেই মানব ব্রহ্মরুপী উদ্বৃত্ত সত্তাকে অনুভব করি।

রবীন্দ্রনাথ 'The Religion of man' শীর্ষক বক্তৃতায় প্রকৃতির বিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষের উদ্বৃত্ত ধারনাটি ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেছেন, মানুষ স্বাধীন অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করল নিজের দেহভঙ্গিমার পরিবর্তন ঘটিয়ে। অভিব্যক্তি ধারার ব্যাতিক্রম ঘটিয়ে মানুষ জন্তুর চতুষ্পদী ভঙ্গিমার পরিবর্তে দু-পায়ের উপর ভর করে ঋজু হয়ে মানুষ উঠে দাঁড়ালো। এই দু-পায়ে দাঁড়ানো মানুষের স্বভাবগত, যা অন্যান্য চতুষ্পদী প্রাণীদের থেকে মানুষকে পৃথক করেছে। রবীন্দ্রনাথ আরও মনে করেন, যে চতুষ্পদী প্রাণীদের দৃষ্টি সাধারণত; নীচের দিকে হওয়ায় তাদের দৃষ্টিপাত হয় খণ্ড খণ্ড বস্তুর দিকে। এই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষই তাদের একমাত্র অবলম্বন, যার সঙ্গে কখনো বা যুক্ত

হয় কারো কারো ঘ্রানশক্তি বা শ্রবণশক্তি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সর্বদা অগ্রে প্রসারিত রাখে, তাই সে শুধু খণ্ড খণ্ড বস্তুকে দেখে না, সেই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেকার একটা সম্বন্ধ ও ঐক্য কে উপলব্ধি করে। এই ভাবে মানবদৃষ্টি দেখতে পায় এক অখণ্ড সত্তাকে, যার কেন্দ্র স্থলে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন, 'মুক্ত দৃষ্টি'। পাশাপাশি তিনি একথাও বলেছেন, মানুষ তাঁর ঋজুমুক্ত দেহে চৈতন্যের অধিকারী হয়ে এমন একটা বিরাট জগতের পরিচয় পেয়েছে যেখানে সে কেবলমাত্র খাদ্য বস্ত্রের চাহিদায় নিমগ্ন থাকেনি।

পুরু ত্বক, বড়ো বড়ো নখ, দাঁত, শুঁড়, ডানার মতো অঙ্গভার থেকে মুক্ত হয়ে লাভ করেছে এক উন্মুক্ত কল্পনাশক্তি যা মানুষকে প্রদান করেছে মননশীল ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।

সমস্ত দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে নিজের অন্তঃস্থলের অনন্ত সত্তাকে প্রকাশের তাগিদ দেখিয়েছে। ভারত, চীন, পারস্য বা গ্রীসের মতো বিভিন্ন দেশে মানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা বারংবার দৃষ্ট হয়েছে, এবং এটি সম্ভব হয়েছে মানবজীবনের উদ্বৃত্ত স্বরূপ জীবন শক্তির জন্য। মানুষ মরণশীল জীব হয়েও নিজেকে অমৃতের অধিকারী করতে চায়। সে সাহিত্য রচনা করে একজন শিল্পী হয়ে উঠে। কারণ সে বিশ্বাস করে তাঁর ব্যাক্তিগত দৈহিক পরিচয় তার আসল পরিচয় নয়। তার প্রকৃত পরিচয় একজন বিশ্বজনীন সৃষ্টিশীল মানব হিসাবে যার মধ্যে নিজেকে সকলের সঙ্গে যুক্ত করার তীব্র আকুলতা রয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যদি আমরা রোম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুলি দেখি, সেগুলি কেবলমাত্র রোমের তৎকালীন অধিবাসীদের জন্য নয়। সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের কাছে সেগুলি সমানভাবে গ্রহণযোগ্য ও উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে সমাদৃত হয়ে চলেছে। তাই এই রোম সভ্যতার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলিকে মানুষের উদ্বৃত্ত সত্তার পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন জীবজগতে মানুষের চৈতন্যশক্তি, কল্পনাশক্তি ও সৃষ্টিশীলতা তাকে জীবজগত থেকে স্বতন্ত্র্য নিয়ে তৃপ্ত থাকেনি।

'আমি কে' এই আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর দেওয়ার ব্যাকুল বাসনায় মানুষ নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই পশু জগতের সুখ কখনো মানুষকে তৃপ্ত করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে কবি 'বড়ো আমি' এবং 'ছোট আমি' এর প্রসঙ্গে এনেছেন। 'ছোট আমি' একটি অহংকারের আবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখে। সে হল আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মগরিময় অন্ধ। কিন্তু 'বড় আমি' সত্যতার পথে অনুসন্ধিৎসু। তাই এই 'বড়ো আমি' মানুষের ও সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারে। মানুষের প্রগতি সর্বদা ভবিষ্যৎ অমুখী। মানুষ চায় তার 'বড়ো আমি' কে প্রকাশ করতে। তাই সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে। আর সেই কারণেই মানুষের মধ্যে রয়েছে দ্বৈত অধিকার- মৃত্যুর অধিকার ও অমৃতের অধিকার। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু রবীন্দ্রমনন যাকে 'মানুষ' বলে অভিহিত করেছে, তার মৃত্যু নেই। সে মানব, তাই সে অমর। আর এখানেই সার্থক রবীন্দ্রধারনায় 'মানুষ'।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে মানুষের ধর্মচেতনার ইতিহাসটিকেও অনুধাবন করেছেন। তিনি ধর্ম বলতে মহাজাজতিক, বিমূর্ত বা অলৌকিককে বোঝায়নি। তাঁর কাছে ধর্ম কোন আচার অনুষ্ঠান নয়, তাঁর মতে ধর্ম হচ্ছে মানুষের স্বভাব। এই স্বভাবটি হল মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্ব হল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি। তিনি বলেছেন,

> "স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তাঁর মূল প্রেরণা দেখি জীব প্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি 'মনুষ্যত্ব' আর এই মনুষ্যত্বই হল মানুষের ধর্ম।"[৬]

আসলে রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্বের সাধনা, যা দেশ, কাল বা কোন ধর্মের গণ্ডিতে থেমে থাকেনি। এই সাধনার জন্য মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ ব্রহ্ম তারই মধ্যে অভিব্যক্ত। এই মানবব্রহ্ম কোনো এক বিমূর্ত কল্পনা বা আইডিয়া নয়, অথবা উপনিষদের শুদ্ধ চৈতন্যময় সত্তামাত্র নয়। মানুষের মধ্যে যে মহান গুনাবলি নিহিত আছে। যার স্বল্পতম বিকাশে মানুষ নিজেকে 'মানুষে'র পর্যায় তুলে আনে, যেখানে পশু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে যায়- সেই গুণাবলির শ্রেষ্ঠ বিকাশ যে আদর্শের মধ্যে- মানবব্রহ্ম সেই মূর্ত মানবসাপেক্ষ আদর্শেরই প্রতীক। মানুষ ছাড়া এই আদর্শের কল্পনা করা যায় না। এই পরমসত্যকে তিনি বারবার বলেছেন।[৭]

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন।[৮] একথার অর্থ হল দেবতা বা ভগবান নয়, মানুষরূপী ভগবান মুখ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'জীবনদেবতা' বলেছেন। তা কোন মন্দিরের দেবতা নয়। কোন ধর্মেই এই দেবতাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দেবতার অবস্থান মানুষের মধ্যে।

তিনি বলেছেন,

> "...in order to know himself truly, Man in his religion cultivates the vision of a Being who exceeds him in truth and with whom also he has kinship."[১০]

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩ সাল।

২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। আমি। শ্যামলী কাব্যগ্রন্থ, ১৯৩৬ সাল।

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড)। শতবার্ষিকী সংস্কার, পৃ. ৩৫২।

৪। তদেব, পৃ. ৫৬৯।

৫। Tagore, Rabindranath. Sadhana (the realization of life). 1954.

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম্ম। https://www.tagoreweb.in/Essays/manusher-dharma-116/manusher-dhormo-2370/3 প্রবেশের তারিখ: ৮, জানুয়ারি ২০২৬।

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম, ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৩ সাল, পৃ. ৫।

৮। মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ। দেশ। সাহিত্যসংখ্যা, ১৯৩৮, পৃ. ৫৮।

৯। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। পৃ. ১৩৯।

১০। Tagore, Rabindranath. The Religion of Man. 1922. Chapter III – "The Surplus in Man," page 63.

গ্রন্থপঞ্জি:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। মানুষের ধর্ম্ম, ভূমিকা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৩।

২। Tagore, Rabindranath, The Religion of Man First Published 1922,

৩। Tagore, Rabindranath, Sadhana (the realization of life), First Published, 1954

৪। বন্দ্যপাধ্যায়, হিরণ্ময়। উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ। নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম সংস্করন, ১ জানুয়ারি ১৯৫৯।

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী ১২খণ্ড। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৪২৩ সন।

৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান। অনুবাদ সেনগুপ্ত শংকর, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল ২০২১।

৭। পাল, সন্দীপ। রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তা। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, প্রথম সংস্করন, জুন ২০২১।

৮। ভট্টাচার্য, সেবন্তী। আধুনিক ভারতীয় দর্শন। এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করন, জানুয়ারি ২০২২।

৯। চক্রবর্তী, নির্মাল্য নারায়ন। বিংশশতাব্দী ভারতীয় দর্শন চর্চা। ঘোষ পৃথা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-৯১, প্রথম সংস্করন, জানুয়ারি, ২০২০।

১০। বন্দোপাধ্যায়, সৈকত। বিংশশতাব্দীর ভারতীয় দর্শন। নবোদয় পাবলিকেশনস, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করন ২০২৩-২০২৪।